নদী বয় তার চেতনায় :
বিষ্ণু দের কবিতায় প্রত্নপুরাণ

গৌতম ভট্টাচার্য

বিষ্ণু দের (১৯০৯—১৯৮২) প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যাবসায় [১]। ওই কাব্যগ্রন্থে তিনি ক্রমে টের পেয়েছিলেন যে এ নতুনত্ব কায়দার নয়—এ লেখকের ব্যক্তিত্বেরই আরেক প্রকাশ [২]। প্রথম প্রকাশিত রচনায় যার পরিচয় যে-কোনও লেখকের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়।

যে-কোন তরুণ লেখক যেভাবে শুরু করেন—"পূর্বসূরীদের"—জীবনানন্দ যেমন বলেছেন—"মর্মান্তিক শ্রদ্ধার সঙ্গে সরিয়ে রেখে...", বিষ্ণু দে-ও তার ব্যতিক্রম নন। "রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ললিত কাব্যময়তাকে, ঝড়ো হাওয়া আর ভাঙা দরজাটা মেলাবার ঔপনিষদিক দৃষ্টিকে অস্বীকার করে, কটাক্ষ করে, আত্মপরিচয়ের দাবীতেই তিনি বোধহয় তৈরি করে নিচ্ছিলেন তাঁর নিজস্ব ভূবন, যেখানে—"এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে" কোদালের ঘায়ে তৈরি হবে নতুন পথ—"নতুন কালের জোরালো পথিকের পায়ের তলায় সে ক্রমে সমান হয়ে আসবে"[৩]।

তাঁর সেই জগৎ দুশো বছরের বিদেশী শাসনের পেষণে মৃতপ্রায়, চাপা পড়া ঘাসের মতো পান্ডুর, ঔপনিবেশিক বণিক সভ্যতার তল্পিবাহক, মধ্যসত্ত্বভোগী, অলস, পরজীবী, চাকুরীরত ছোটোখাটো ব্যবসায়ী বা দালাল অধ্যুষিত সংকীর্ণ জগৎ যার খানাখন্দ ভরা রাস্তার ময়লা জলে ছায়া ফেলে রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত, রোমান্টিক, উদাত্ত আকাশ—তৈরি হয় এক উদ্ভট চিত্রকল্প যেমন— "বড়োবাজারের উপল উপকূলে/জনগণের প্রবল স্রোত উগারিছে ফেনা"। বিড়ি, সিগারেটের ধোঁয়া, পানের পিক—এরকম শব্দের ছবির মিছিল আসছে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত দুঃসময় কবিতার অদম্য প্রাণের প্রতীক 'বিহঙ্গে'র খোঁজ পড়ছে রাস্তার ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা ট্যাক্সিকে উদ্ধারের কাজে (টপ্পা-ঠুংরী), অথবা ধোঁয়ায় মলিন, শব্দখর এই কুৎসিত নগরে নামছে তন্দ্রালসা সন্ধ্যা (উর্বশী ও আর্টেমিস)। হয়তো এভাবেই, তিনি, বিষ্ণু দে, আঘাত করে চিনে নিতে চাইছিলেন বাংলা কবিতার আত্মাকে, জাতীয়, বিজাতীয় শব্দ প্রহার করে বুঝে নিতে চাইছিলেন তার হৃদয়ে পৌঁছবার রাস্তা আর স্বভাবে লিরিক্যাল হবার সুবাদে পূর্বসুরী রূপে সামনে ছিলেন অবশ্যই মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সম্ভবত সেই সূত্রেই রামায়ণ মহাভারতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য পুরাণ, মহাকাব্য ক্রেসিডা, কাসান্দ্রা আর টাইরেসিঅসরা, পরাধীনতার পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্রতার, শুধু প্রাণধারণের তুচ্ছতার গ্লানিময় মুহূর্তে, বিদ্রোহী তারুণ্যের সামনে দৈবায় ও হিন্দু পুরাণের চরিত্রগুলির চেয়ে, পুরুষাকারের, অদম্য প্রাণশক্তির, আপোষহীন স্বাধীনতার প্রতীক পাশ্চাত্য পুরাণের চরিত্রগুলির আবেদন যদি বেশি মনে হয়, তবে তাতে খুব অস্বাভাবিকতার বোধহয় কিছু নেই।

---

(১) বিষ্ণু দে-কে রবীন্দ্রনাথ—৪ নং পত্র। রবীন্দ্ররচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ।

(২) ঐ ৫নং পত্র।

(৩) ঐ ৪ নং পত্র।

গভীর ইতিহাসবোধ, প্রগাঢ় সমাজমনস্কতা, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদির নন্দন তত্ত্বে অনায়াস বৈদগ্ধ্য এবং দেশী, বিদেশী স্বল্প পরিচিত, বা অপরিচিত অনুষঙ্গের অনর্গল ব্যবহার, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে-কে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত কবি এক অখণ্ড সময়চেতনার নিরিখে সময়কালকে অবলোকন করেছেন। অনেক শতাব্দীর "রণ-রক্ত-সফলতা" পরিক্রমা করে তাঁর কবি হৃদয় প্রেমে, শ্রমে ও মানবিক চৈতন্যে নবীন "এক সক্ষম স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর অন্বিষ্টকে খুঁজে পেয়েছেন।

তাঁর এই সময়হীন অন্বেষার অন্যতম প্রধান অবলম্বন হল তাঁর কাব্যে মিথ্ বা পুরাণ প্রতিমার পর্যাপ্ত ব্যবহার। দেশী, বিদেশী, পৌরাণিক, লৌকিক—সব ধরনের পুরাবৃত্তের আড়ালে তিনি ইয়ুং কথিত কালেকটিভ আনকনশাস্ বা যৌথ চেতনার স্বরূপটিকে সন্ধান করেছেন। লক্ষ্য—দেশকাল নিরপেক্ষ মানবসত্তাটিকে চিহ্নিত করা।

বিদ্যোৎসাহী স্বচ্ছল পরিবারের উদার সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা কবি বিষ্ণু দে যেন প্রায় এলিঅটিয় সংজ্ঞা মেনে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন মানবসভ্যতার আবহমান সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে। পরে এলিঅটের কাব্যাদর্শে নৈর্ব্যক্তিকতার স্বার্থে এবং তারও পরে মার্কসীয় কালচেতনার প্রেক্ষিতে তাঁর কাব্যে মিথ বা পুরাণের ব্যবহার প্রায় এক অনিবার্য ভবিতব্য। আদিম কোন সমাজের স্মৃতিভাণ্ডাররূপে, বাস্তব ও কল্পনার এক জটিল বয়নশিল্প হিসেবে বা চিরকালীন মানবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে মিথ বা পুরাণ চিরদিন কবি-শিল্পীদের কাছে এক প্রিয় বিষয়। পুরাণের বিশাল প্রেক্ষাপট সৌন্দর্যে, প্রেমে, শক্তিতে, জ্ঞানে, কৌশলে, নিষ্ঠুরতায় পৌরাণিক চরিত্রের বলিষ্ঠ বহুমুখীনতা ও বিশ্বজনীনতা বিষ্ণু দে'র অখণ্ড চৈতন্যে'র ধারণায় সহজ প্রশ্রয় পায়, কেননা বিষ্ণুদে লক্ষ্য করেন—"নৈর্ব্যক্তিকতা বা ধ্রুপদী শান্তির নির্ভর সমাজব্যাপী পুরাণে, যে পুরাণ গোটা একটা সমাজ-সংস্কৃতির একতায় ব্যক্তি সাধারণকে আশ্রয় দেয় (টি. এস. এলিঅটের মহাপ্রয়াণ/রুচি ও প্রগতি)। পাশাপাশি তিনি এও লক্ষ্য করতে ভোলেন না যে "পুরাণের পটভূমির খোঁজে কালোপযোগী পরিবর্তনে ভীরুর গন্তব্য হয়ে পড়ে ফ্যাসিজমের স্নায়ু বিকারে জোর করে তৈরি সাময়িক একতার ছক" (প্রাগুক্ত)। তাঁর কবিতায় তাই আমরা স্থিতাবস্থার সমর্থনে নয়, প্রগতির, পরিবর্তনের বা জীবনের স্বপক্ষে পুরাণের প্রয়োগ দেখতে পাই। ফলত তাঁর 'পদধ্বনি' কবিতায় (পূর্বলেখ) মহাভারতের অন্যতম নায়ক অর্জুন-হৃতবীর্য, ক্ষয়িষ্ণুপরজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ—অন্যদিকে বহু নিন্দিত দস্যু দল বিপ্লবের পথে ক্রম অগ্রসরমান পরিবর্তনকামী সুস্থ শক্তির প্রতীক—

কার পদধ্বনি আসে? কার?
একি হল যুগান্তর! নব অবতার!
এযে দস্যুদল!
... ...
... ...
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্য্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দিঘি ও খামার

দস্যু দল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে
দৃপ্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর
দস্যু দল এলো কী দুয়ারে? (পদধ্বনি/পূর্বলেখ)

একইভাবে ওই কাব্যগ্রন্থেরই 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় কবি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিকে মনে রেখে বা বলা ভাল সেই পরিত্রাতারূপে বর্ণিত চরিত্রের আবির্ভাব কামনা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলার বা আরো নির্দিষ্টভাবে কলকাতার ভয়াবহ অবক্ষয়ী চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ধিক্কার জানিয়েছেন এই নিস্পৃহ মনোবৃত্তিকে—

আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্য সংগীতে
অনিমা সঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে
হে মৈত্রেয় আত্মীয় সোদর
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদগীথ মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই
কুম্ভীরক তাই।।

'সন্দীপের চর'' কাব্যগ্রন্থের 'মৌভোগ' কবিতাতেও আমরা দেখি কবির হাতে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মতো লোকপুরাণের চরিত্র 'লালকমল', 'নীলকমল' যেন শোষণকারী শক্তি রাক্ষসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সংগ্রামী জনতার প্রতীক—

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লালতিলকের ললাট রাস্তা উষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?

ওই একই কাব্যগ্রন্থের 'কাসান্ড্রা' কবিতায় গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র ভবিষ্যদ্‌বক্তা কাসান্ড্রাকে সামনে রেখে অত্যাচারিত জনতার হয়ে কবির প্রশ্ন—

''আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে মায়াননে
আমরা খুঁজিনি মর্ত্যরূপের ঐশী সীমা
ইথাকায় কভু কলা কৌশলে কিনিনি নাম,
তবু কেন মরি ঘরে বসে লোভী ট্রয়ের রণে।''

আবার ওই একই চরিত্রকে নিয়ে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'কাসান্ড্রা' কবিতায় প্রতিবাদী কাসান্ড্রার উজ্জ্বল উপলব্ধি

''কাসান্ড্রা ঘুরি অতন্দ্র চোখে পথে পথে বন্ধুর
অজেয় আমার আলুলিত বেণী, যুগান্ত সংহতি।।''

মিথ্ বা পুরাণ প্রতিমার ব্যবহার তাই বিষ্ণু দের শত আলোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাঁর কাব্যে মিথের ব্যবহার পূর্বাপর করলে তার মধ্যে দিয়ে কবির কাব্যাদর্শের হদিশ ও তার বিবর্তনের ইতিবৃত্তটির নাগাল পাওয়া যেতে পারে।

ত্রিশের দশক বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এক ক্রান্তিকাল। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনীতির ক্ষেত্রে জার্মানি, ইতালি, স্পেন, জাপান প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উত্থান, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা ফ্রয়েডের চেতন অবচেতন মতবাদ—ইত্যাদির প্রভাবে যুগযুগ লালিত মানবসভ্যতার ভিত্তিভূমিই বিরাট এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে তখন দাঁড়িয়ে। জ্ঞানের নির্গুণত্ব, সৃষ্টির মানবকেন্দ্রিকতা বা সময়ের অখণ্ডতা ইত্যাদি তত্ত্ব তখন নতুন করে পরীক্ষিত হতে আরম্ভ হয়েছে। মোটকথা একজন আলোচক যেমন দেখেছেন—"যত দিন যাচ্ছে মানুষ উপলব্ধি করছে প্রকৃতি ও বস্তুজ্ঞান ভিত্তিরূপে বর্জনীয়। যেহেতু তা খণ্ডিত, তার স্থানে আত্মজ্ঞানই গ্রহণীয়। এই আত্মজ্ঞান অন্তর্দৃষ্টিমূলক এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রকাশমান। এই আত্মজ্ঞান বা আত্মসচেতনতা আত্মসর্বস্বতা নয়, আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ[৪]। মিথের মধ্যে যেহেতু গভীর, জটিল, রহস্যময়, অনির্দ্দেশ্য আত্মপরিচয়ের উৎস রয়ে গেছে বলে অনুমান করা হয়, কবি সাহিত্যিকরা তাই তাঁদের রচনায় মিথকে ব্যবহার করতে চাইলেন খানিকটা আধুনিকতার শর্ত মেনে, খানিকটা বিষয়ের দাবিতে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মুষ্টিমেয় সুফলের মধ্যে রেনেশাঁ উত্তর ইউরোপ এবং তার মাধ্যমে সারা বিশ্বের সঙ্গে মানসিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের যে সুযোগ আমাদের কবি সাহিত্যিকরা পেয়েছিলেন তারই সূত্র ধরে প্রধানত এলিঅট, ইয়েটস প্রদর্শিত পথে ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতায় মিথের ব্যবহারের সূত্রপাত। বলা বাহুল্য এর জন্য প্রয়োজন গভীর অধ্যয়ন, অনুশীলন, বিষয়ের উপর অনায়াস অধিকার—সেদিক থেকে ত্রিশের দশকের কবিরা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যেতে পারে। বাংলা কবিতায় পুরাণ প্রয়োগের অন্যতম পথিকৃৎ বিষ্ণু দেও তার ব্যতিক্রম নন।

বিষ্ণু দে'র পরিবারের সাহিত্য রচনার ইতিহাস না থাকলেও বিদ্যাচর্চার কোনো অভাব ছিল না। বিষ্ণু দে'র পিতামহ বিমলাচরণ ও তাঁর অগ্রজ শ্যামাচরণ কৃতবিদ্য মানুষ ছিলেন। কবির স্মৃতিচারণ[৫] থেকে জানা যাচ্ছে তাঁদের পৈত্রিক বাড়ীতে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তির যাতায়াত ছিল। তাঁরা অনেকেই ছিলেন বিষ্ণু দে'র পিতামহ বা তাঁর অগ্রজের বন্ধু। তাঁর স্মৃতিকথায় কবি জানাচ্ছেন—"বছর দশ-বারো হাতের কাছে যা পেয়েছি পড়েছি। সিঁড়ির তলায় দুটো আলমারি ছিল। একটাতে অনেক চিঠিপত্র—বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথেরও। ছেলেবেলায় সেসব বই আমি নাড়াচাড়া করতে পারতুম, কোনো বারণ ছিল না—ইংরেজিতে যাকে বলে Browse করা—আমার মনে হয় ছেলেবেলায় সেটা খুব সাহায্য করে। ছাত্র হিসেবে তিনি খামখেয়ালি করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন [৬]। তাঁর বাবার পরামর্শে সে যাত্রা নিরস্ত্র হলেও তাঁর পড়াশোনায় বেশ ক্ষতি হয় বলে মনে হয়। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এর ক্ষতিপূরণ করে নেন এবং কলেজে তাঁর

(৪) আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব/মঞ্জুভাষ মিত্র/আধুনিক বাংলা কবিতায় ইওরোপীয় প্রভাব।

(৫) স্মৃতিচারণ—ছড়ানো এই জীবন/১৯৭৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

(৬) ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা—বিষ্ণু দে/অরুণ সেন

সহপাঠীর বর্ণনায় জানা যাচ্ছে কবি মেধাবী এবং পাঠ্যানুরাগী ছাত্র হিসেবে তখনই বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর সেই সহপাঠী বরেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের ভাষায়—'ক্লাসে কোনো নোট নিতে তাঁকে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। অধ্যাপকের কোনো প্রশ্নের উত্তরে সকলে যখন নিরুত্তর—সেই সময় দু-একবার উত্তর দিতে শুনেছি [৭]। শ্রীরায় আমাদের আরো জানাচ্ছেন—' বিষ্ণু দে'র মাধ্যমেই প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এলিঅটের লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। চিত্রকর পরিতোষ সেনও তাঁর স্মৃতিকথায়, জানিয়েছেন আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও আগ্রহের কথা [৮]। তাঁর একসময়ের ছাত্র সত্যেন্দ্র আচার্যের রচনায় পাচ্ছি কলেজের লাইব্রেরিতে শিক্ষক বিষ্ণু দে'র আর এক জ্ঞানপিপাসু চেহারা—"বই দেখতেন ঘুরে ঘুরে। বই টেনে দাঁড়িয়ে পাতা ওল্টাতেন। কিন্তু নিতেন খুব কম। শিক্ষকতার জন্য তাঁর বিষয়ের বই ছাড়াও ঘাঁটতেন দর্শন, ইতিহাস ও অন্যান্য নানা বিষয়।" কন্যা উত্তরা বসু চেনাচ্ছেন স্নেহশীল পিতা বিষ্ণু দে-কে যিনি তিন নাবালক সন্তানকে দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি সঙ্গ দিতেন। কত কবিতা পড়ে শোনাতেন—শেলী, কীটস, ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথের লিপিকা ও ক্ষণিকা থেকে। সন্ধেবেলায় রেকর্ড বাজাতেন—বাখ, বেটোফেন, মোৎসার্ট, শুবার্ট বা ভাগনার [১০]। ছুটির দিন সেল্‌ফ ঝাড়বার জন্য ডাক দিলে পরম উৎসাহে কবিতা, দর্শন, নাটক বা ইতিহাসের বই ঘাঁটাঘাঁটি করতাম [১১]। পরবর্তী প্রজন্মের কবি সমর সেন কিন্তু এই পঠন-পাঠনকে দেখছেন বিষ্ণু দে'র কবিতার হয়ে ওঠার পিছনের এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ রূপে। কবিত্বের সঙ্গে পঠন-পাঠনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এইভাবে—"Infact, in those days, he and some of his friends presented a different picture of the functions of the poets. They were not men so drunk with the martyrs of life, nature and women, that poetry pushed out. Poetry require discipline as well as inspiration. It was a part of many faceted tradition and demanded knowledge of philosophy, music and painting—both Indian and Western, acquaintance with Abdul Karim Khan, Jamini Roy, Bach and Beethoven—and later Marx and Lenin, as well as Freud. Rabindranath and Shelley were not enough, writers of English were not enough—one had to know something about the French symbolists, Rilke and some of the Russians. One had to go deep into Sanskrit literature [১২].

কবিত্বের সঙ্গে মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন যোগের যে ধারণা আবহমানকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল—ত্রিশের তরুণ কবিরা যেন তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই কাব্য রচনায় হৃদয়ের পাশাপাশি এমনকী কোনো কোনো জায়গায় মস্তিষ্ককে হৃদয়ের ওপরে স্থান দিয়ে কাব্যচর্চা

---

(৭) সাক্ষাৎকার ঃ বরেন্দ্রপ্রসাদ রায়/এবং এই সময়/বিষ্ণু দে সংখ্যা।

(৮) আড্ডাপ্রিয় বিষ্ণু দে/পরিতোষ সেন/উৎস—ঐ

(৯) শিক্ষক বিষ্ণু দে/সত্যেন্দ্র আচার্য্য/উৎস—কবিপত্র বিষ্ণু দে সংখ্যা/অক্টোবর, ১৯৮৬।

(১০) পিতৃস্মৃতি ঃ উত্তরা বসু/এবং এই সময়/বিষ্ণু দে সংখ্যা/অক্টোবর ১৯৮৬।

(১১) ঐ। পৃঃ-৭৩

(১২) The Still Centre / Samar Sen / Bangla Kabita / Vishnu Dey Spl. Number, April '70.

শুরু করলেন। বিষ্ণু দে'র অন্যতম ঘনিষ্ঠ অরুণ সেন আমাদের জানাচ্ছেন—বিষ্ণু দে প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেন খুবই অল্প বয়সে—ছোটোদের একটি মাসিক পত্রিকার জন্য... কিন্তু কোনো এক নাটকীয় আতিশয্যে দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্য ছুঁড়ে ফেলে দেন কারণ তাঁর মনে হয়েছিল কবিতা রচনা অত সহজ অত সাবলীল হওয়া উচিৎ নয় [১৩]। এই প্রসঙ্গে অন্য এক প্রবন্ধে শ্রীসেন বিষ্ণু দে'র নন্দনতত্ত্বকে বুঝতে লক্ষ করেছেন বিষ্ণু দে'র মধ্যে সমগ্রতার সেই বোধের কথা যার প্রভাবে কবির মনে হয়েছিল—"যদি কারো আধুনিক সংগীত ভালো লাগে অথচ আধুনিক কাব্য অথবা চিত্র অসহ্য মনে হয় তাহলে তাঁর সততায় নয়, স্বভাবের সমগ্রতায় সন্দেহ স্বাভাবিক [১৪]। এই সমগ্রতার বোধ থেকেই বিষ্ণু দে বলতে পারেন যে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে একটা পরম ঐক্য—জটিল সত্যকে স্বীকার করার মানসিকতার ঐক্য। এইখানেই আধুনিক শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মিল, স্থুল বুদ্ধির ব্যাকরণে তাঁরা বিশ্বের চিত্র মন-গড়া করেন না। সরলতা নয়—সততাই লক্ষ্য [১৫]।

খানিকটা প্রভাবের এই প্রবর্তনা, কিছুটা সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর কিছুটা সময়ের বৈশিষ্ট্য বিষ্ণু দে'র কাব্যে বিদেশী পুরাণের ব্যবহারের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এক গবেষকের ভাষায়—"প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে, মূল্যবোধের পতনে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে... তীব্র যুগ চেতনা, যুগ-যন্ত্রণা, অবক্ষয়ের বোধ এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য আধুনিক কালের নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নির্দেশিত পথে প্রাচীন মিথ্ কাহিনির আশ্রয়ে নিজস্ব এবং সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসা রূপায়নের প্রয়াস দেখা গেল [১৬]। আধুনিকতা যে নৈর্ব্যক্তিক আত্মপরিচয়ের সন্ধান করে ক্লাসিক মিথিক চরিত্রের ব্যবহারে সেই মাত্রা অর্জিত হবার সম্ভাবনা সমধিক—এ তত্ত্বও বিষ্ণু দে'র কাব্যে বিদেশী পুরাণের ব্যবহারের উদ্দেশ্য হতে পারে। বাংলা এবং ইউরোপীয় প্রধানত ইংরেজির ভাষাগত (ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক) দূরত্বের ফলে বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব প্রায় ঐতিহ্যের মতো ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে বাঙালি কবির পরিগৃহীত বিদেশী প্রভাব হয়ে উঠেছে নতুন সৃষ্টি—এরকম উচ্চারণও একজন সমালোচকের [১৭]। এই বিদেশী পুরাণের ব্যবহারকে একটু বিস্তারিত অর্থে অর্থাৎ পাশ্চাত্য অনুষঙ্গের প্রসঙ্গে গণ্য করলে এর আরো একটি স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। একজন আধুনিক কবির পক্ষে (তাঁর কাব্যে) পাশ্চাত্য প্রসঙ্গের ব্যবহারের প্রথাসিদ্ধ কারণ তাঁর মানসিক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তীব্র অনুভূতির মুহূর্তে উপযুক্ত শব্দচয়নের প্রয়োজনে কবির সামনে তাঁর সমগ্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অবারিত থাকে যার থেকে প্রয়োজনে কবির রচনায় পাশ্চাত্য অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্পের উপস্থিতি একান্তই স্বাভাবিক [১৮]। সেইসঙ্গে বর্তমানের প্রতি

---

(১৩) বিষ্ণু দে ঃ জীবন, কবিতা ও নন্দন/অরুণ সেন/বিষ্ণু দে'র নন্দন বিশ্ব।

(১৪) সাহিত্যের ভবিষ্যৎ/বিষ্ণু দে/সূত্র—ঐ পৃঃ-১৬।

(১৫) পরিবর্তনমান এই বিশ্বে/বিষ্ণু দে/সূত্র—ঐ পৃঃ-১৩।

(১৬) বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার/কমলেশ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ-৮৫।

(১৭) আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব/মঞ্জুভাষ মিত্র/পৃঃ-৩৪।

এক ধরণের অনাস্থাবোধ কবিকে প্ররোচিত করেছে অতীত স্মৃতিলোকের অন্বেষণে বা শূন্যতাবোধে। অসঙ্গতি পূর্ণ, খণ্ডিত বর্তমানের মধ্যে কল্পনাদর্শকে খুঁজে পাবার প্রত্যয়, এখানে নির্লক্ষ্য [১৯]। একজন আধুনিক কবির প্রার্থিত নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং চেতনার সামগ্রিক অর্জনের লক্ষ্যে অপরিচিত দূর অতীতে শিকড়ের সন্ধান বোধ হয় অনিবার্যই। তবে বিষ্ণু দে'র কবিতায় বিদেশী পুরাণের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আমরা লক্ষ্য করি কবিজীবনের প্রথম পর্বের রচনায়। ক্রমে দেখা যায় বিদেশী পুরাণের জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে প্রথমে ভারতীয় (পূর্বলেখ পর্ব থেকে) ও পরে লোক পুরাণের চরিত্রেরা ('সাত ভাই চম্পা' পর্ব থেকে)। শেষে আমরা লক্ষ্য করি উভয় ঐতিহ্যের এক সমন্বয়ের চেহারা—যেখানে গ্রীক মিথের "প্রসার্পিনা" ও দেশীয় মিথিক চরিত্র উলুপী একাকার হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলার দ্যোতনা দিতে গিয়ে ব্যবহৃত হয় গ্রীক শব্দ 'এটাকসিয়া' বা সুষুপ্তির বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে আসে 'এফেমাশি' সব মিলিয়ে বিশেষ কোনো দেশের নয়, পৃথিবীব্যাপি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সূচিত হয় [২০]।

বিষ্ণু দে'র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে শুরু হয়ে 'পূর্বলেখ' পর্যন্ত বিস্তৃত রচনায় ব্যবহৃত বিদেশী পুরাণ প্রতিমার যদি একটি রেখাচিত্র টানা যায় তবে তা চোরাবালিতে শীর্ষাভিমুখী হয়ে ফের পূর্বলেখতে নিম্নগামী হবে। তাঁর ব্যবহৃত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ প্রতিমাগুলির কিছু পরিসংখ্যান এইরকম [২১]।

কাব্যগ্রন্থ	রচনাকাল	কবিতা	ব্যবহৃত প্রতিমা	উৎস
উর্বশী ও আর্টেমিস	১৯২৬-১৯৩২	১। বজ্রপাণি	১। ড্যানায়ে	গ্রীস
		২। সাগর উত্থিতা	১। ডায়না	"
		৩। পর্যাপ্তি	ক. এথিনা	"
			খ. নেয়াড	"
		৪। সন্ধ্যা	১। ম্যামথ	প্রাগৈতিহাসিক প্রাণি
			২। নেআন্ডারতাল	প্রাচীন মানব প্রজাতি
		৫। উর্বশী ও আর্টেমিস	১। ওরায়নপ্রিয়া	গ্রীস
			২। ট্রিস্টান ইসালডো	পাশ্চাত্য উপকথা
			৩। স্যর্সি	গ্রীক-পুরাণ
			৪। ম্যামন	পাশ্চাত্য পুরাণের ধনদেবতা
			৫। ক্লিওপেট্রা	মিশরের রাণী
			৬। ভিনাস	রোমান দেবী
			৭। হেক্টর	গ্রীক মহাকাব্য
			৮। আর্টেমিস	গ্রীক দেবী
			৯। এরস	গ্রীক প্রেমের দেবতা

(১৮) বিষ্ণু দে ঃ বিস্তীর্ণ দিগন্ত (চোরাবালি)/সরোজ চৌধুরি।

(১৯) নান্দীমুখ/বিষ্ণু দে সংখ্যা ১৯৭৩ ঃ আগরতলা, ত্রিপুরা।

বিষ্ণু দে'র কাব্য ঃ পুরাণ প্রসঙ্গ/ বেগম আক্তার কামাল। পৃঃ-১৫।

(২০) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়/দীপ্তি ত্রিপাঠী। পৃঃ-২৩।

(২১) এবং এই সময়/বিষ্ণু দে সংখ্যা/অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়/অক্টোবর '৮৯—ফেব্রুয়ারি '৯০।

			১০। হিপোলিটস	গ্রীক দেবতা
			১১। উর্বশী	ভারতীয় পুরাণ
চোরাবালি	১৯২৬—১৯৩৭	১। সন্ধ্যা	১। এফেশাস	প্রাচীন গ্রীক নগর
			২। উলুপী	ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র
		২। পঞ্চমুখ	১। প্রসার্পিনা	গ্রীক পুরাণের চরিত্র
		৩। কবি কিশোর	১। আর্কেডিয়া	প্রাচীন গ্রীক বনাঞ্চল
		৪। যযাতি	১। প্রসার্পিনা	গ্রীক পুরাণের চরিত্র
		৫। প্রথম পার্টি	১। ল্যাজারাস	বাইবেলে বর্ণিত চরিত্র
		৬। কথকতা	১। হেলেন	গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ডের চরিত্র
			২। অর্ফিয়ূস	গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর পুত্র
			৩। পেনেলোপি	ওডিসি মহাকাব্যের বীর অডিসিয়াসের স্ত্রী
			৪। ইথাকা	ওডিসি মহাকাব্যে বর্ণিত ওডিসিয়াসের প্রাসাদ গ্রীক দ্বীপ বিশেষ
			৫। ডালহালা	জার্মান-পুরাণে বর্ণিত বিশাল প্রকোষ্ঠ
			৬। সীগফ্রিড	জার্মান মহাকাব্যিক চরিত্র
পূর্বলেখ	১৯৪১	লায়ন্স রেঞ্জ	১। উলুক	মহাভারতে বর্ণিত শকুনির পুত্র
		আবির্ভাব	১। সবিতুর্বরেন্যম	উপনিষদ
			২। ধীমহি প্রচোদয়াৎ	"
		বৈকালি (কুমারকে)	১। নাচিকেত	"
		কাজলা	১। পূষণ, ইরম্মদ	"
		জন্মাষ্টমী	১। স্যর গ্যালাহাড	পাশ্চাত্য উপকথা
			২। মাতরিশ্বাবেগে	উপনিষদ

তাঁর ব্যবহৃত পাশ্চাত্য পুরাণ প্রতিমাগুলি নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি মোটামুটি এরকম ঃ

(১) পাশ্চাত্য পুরাণগুলির প্রয়োগ প্রধানত হয়েছে অসঙ্গতি—অর্থাৎ ধ্বংস, অবক্ষয়, বিয়োগান্ত পরিণতি ইত্যাদি সূচিত করতে [২২]। যেমন ঃ

(ক) শালতরু হারিয়েছে সাড়।
রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেভিসের মতো
হৃদয় ধরেছে চেপে। (ওফেলিয়া/চোরাবালি)

(খ) হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে। (ক্রেসিডা/চোরাবালি)

(গ) আজ হতে আমার পৃথিবী

(২২) বিষ্ণু দেঃ এ ব্রতযাত্রায়/অরুণ সেন/পৃঃ-৯১, ৯২।

আজ হতে আমার আকাশ
আজ হতে এ পৃথিবী কঠোর কঠিন
এথিনার মূর্তি পাবে। (পর্যাপ্তি/উর্বশী ও আর্টেমিস)

(২) কালপর্বের দিক থেকে দেখতে গেলে কবির উপর এলিয়টের প্রভাবকাল থেকে পাশ্চাত্য পুরাণ প্রতিমার ব্যবহার শুরু আর পরবর্তীকালে মার্কসবাদে তাঁর প্রত্যয়ের সময়কাল থেকে এই পর্বের অবসান চিহ্নিত হয়েছে [২৩]।

(৩) বিচ্ছিন্নতার, দুর্বোধ্যতার, কম্যুনিকেশনের অভাববোধকে আকার দেবার জন্যেও পাশ্চাত্য পুরাণ প্রতিমার ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করেন কেউ কেউ [২৪]। যেমন ঃ

(ক) পেনেলোপি লুপ্ত হল কবেকার ভূগোলের কোন্ ইথাকায়!
(কথকতা/শিখণ্ডীর গান/চোরাবালি)

(খ) ভ্রান্তি আমারে নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার?
তপ্ত মেরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যান্ডার (ক্রেসিডা/চোরাবালি)

(৪) অখণ্ড মানবচৈতন্যে আস্থা বোঝাতেও বিষ্ণু দে'র কবিতায় এই পাশ্চাত্য পুরাণ প্রতিমার প্রয়োগকে ধরা যেতে পারে। বিষ্ণু দে'র মতে মানবচৈতন্যের আপতিক খণ্ডতার জন্য ধনতন্ত্র দায়ী। কবির সমস্যা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, তা ইতিহাসের সমস্যাও। আর শিল্পী যতই এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হ'ন ততই বিষয়বস্তু ও আধারের বিস্তার ঘটে এবং জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত সমগ্রতা পায় আর সমগ্রের বিকাশের অসীম সম্ভাবনায় শিল্পীর শিল্পী হিসেবে পরিণতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে [২৫]।

বিষ্ণু দে'র কবিতায় ভারতীয় পুরাণ এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি প্রাচ্য পুরাণ তাঁর নির্ভরযোগ্য প্রতীক। আমরা এও দেখেছি প্রথমে বেশি ব্যবহৃত হয়েও পাশ্চাত্য পুরাণের অনুষঙ্গ তাঁর কাব্যে ক্রমশ সীমিত হয়ে এসেছে এবং সে জায়গা দখল করেছে প্রাচ্য পুরাণের বিভিন্ন প্রতিমা। এ ব্যাপারেও তাঁর পূর্বসূরী অবশ্যই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যদিও উভয়ের পুরাণ প্রয়োগের চরিত্র আলাদা। মধুসূদন যেখানে পৌরাণিক চরিত্রগুলির নাটকীয়তাকে তাঁর মহাকাব্যে ব্যবহার করতে চেয়েছেন— বিষ্ণু দে'র লক্ষ্য সেখানে তাদের প্রতীক ধর্মিতা। উর্বশী থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা, উলুপী, সুভদ্রা বা অর্জুন, বজ্রপাণি ইন্দ্র বা যযাতি—এঁরা কেউই তাঁদের পৌরাণিক চেহারায় রঙ্গমঞ্চে আসছেন না। তাঁদের পরিচয় তাঁদের চরিত্রের সেই দ্বান্দ্বিকতা যা তাঁদের বর্তমানকালের নায়ক-নায়িকায় পরিণত করেছে। আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছে বিসঙ্গতির, বিচ্ছিন্নতার সংকটকে বোঝাতে বিষ্ণু দে এনেছেন পাশ্চাত্য অনুষঙ্গ—অন্যদিকে সঙ্গতি ও সাযুজ্যের সন্ধানে ডাক পড়ল ভারতীয় পুরাণের—আবার এমন সর্বভারতীয় পুরাণ যার মধ্যে লোকপুরাণও বর্তমান, যার কথা ও তাৎপর্য লেখাপড়া-না-জানা মানুষজন ও তাদের কথকতা, পাঁচালী থেকে পাওয়া শিক্ষা থেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে [২৬]। উদাহরণস্বরূপ 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পদধ্বনি' কবিতাটির

(২৩) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়/দীপ্তি ত্রিপাঠী/পৃঃ-২৩১, ২৪০-৪১।
(২৪) আধুনিক কবিতা'র দিগ্বলয়/অশ্রুকুমার শিকদার/পৃঃ-২১১
(২৫) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়/দীপ্তি ত্রিপাঠী/পৃঃ-২৩১

কথা স্মরণ করা যেতে পারে—"মৃত্যু ও ধ্বংস, যুগে যুগে প্রতিযোগী দুরন্ত শক্তির আক্রমণ ও পুনরাক্রমণের মধ্যে দিয়ে অর্জুন, সুভদ্রা ও দস্যুদের জীবনে তথা মানবের বংশপরম্পরায় প্রবহমান যে অনিঃশেষ জীবনীশক্তি, তা এই কবিতাটিকে কেবল একটি পুরাণ কাহিনির প্রেমে বন্দী করেনি, বরং পুরাণের অভ্যন্তরীণ মিথ্ কাহিনিটিকেই বর্তমানের ভিতর দিয়ে ভাবীকালের অভিমুখে প্রসারিত করে দিয়েছে [২৭]। এখানে লক্ষ্যণীয় পাশ্চাত্য পুরাণের ব্যবহারের মতো চেতনার একটি অভিজ্ঞতা থেকে অন্য একটি অভিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হবার অভিপ্রায়ে নয় সরাসরি অভিজ্ঞানটিকেই কবি দেশী পুরাণে তুলে ধরেছেন। তাই দেখি অবক্ষয়ের প্রকাশ ঘটে মুষল পর্বে, যেখানে কালের নিয়মে যদুবংশ আত্মধ্বংসে নিয়োজিত। বিষ্ণু দে এই কাহিনির প্রতীকমূল্যে ব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী অপ্রতিরোধ্য বিনাশকে কৃষ্ণের প্রতীকে তুলনা করেছেন [২৮]। 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 'জন্মাষ্টমী', ১৩৫৪ কবিতার নচিকেতা যেন সত্তার সন্ধানী এক চিরযাত্রী, যে প্রতীক আমরা খুঁজে পাই বিভিন্ন দেশের পুরাবৃত্তে—যেমন রাজা আর্থারের মিথে খ্রিস্টের হারিয়ে যাওয়া পানপাত্রের খোঁজে বীর গ্যালাহাডের যাত্রা—যাকে উৎস-সন্ধানী Quester এর প্রতীকে এলিঅট 'wasteland' কবিতায় ব্যবহার করেছেন। আবার পাশাপাশি আমাদের মনে পড়ে যায় পৌরাণিক কাব্যগুলিতে বর্ণিত শব্দের সাহায্যে আঁকা মানুষের নাবিক হৃদয়ের ছবি। এই জ্ঞানপিপাসু যাত্রার কথা বিষ্ণু দে-র সমগ্র কাব্যের মোটিভ [২৯]। বিষ্ণু দে-র কবিতায় ভারতীয় পুরাণ প্রতিমা ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এরকম ঃ

(১) "ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি
প্রাণ সূর্য্যের একান্ত সংহতি।
ক্রান্তি বলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়,
তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্ন সারথি, তোরণ কী যায় দেখা? (মহাশ্বেতা/ চোরাবালি)

(২) "দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার"
(ওফেলিয়া/ চোরাবালি)

(৩) কোনোদিন তুমি বওনি রাজ্যভার
হৃদয় রেখেছো শুচি
কৌটিল্যের মদান্ধ সম্ভার
নিঃশেষ করে দেয়নি তোমার করুণা, স্বচ্ছ রুচি
প্রজ্ঞা তোমার সিংহাসনের কুহকে অন্ধকার
হয়নি একটিবার। (যুযুৎসুর খেদ/অন্বিষ্ট)

আগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে স্বশাসিত এক স্বাধীন ভূখণ্ডের সন্ধানে পথিক বিষ্ণু

---

(২৬) বর খুঁজে ফেরে সত্তা/আধুনিক কবিতা'র দিগ্বলয়/অশ্রুকুমার সিকদার/পৃঃ-৮৯
(২৭) বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার/কমলেশ চট্টোপাধ্যায়/পৃঃ-৮৯
(২৮) বিষ্ণু দে-র কাব্য ঃ পুরাণ প্রসঙ্গ/বেগম আক্তার কামাল/পৃঃ-৪৪
(২৯) ঐ, পৃঃ-৬৯

দে-র এই যাত্রা তাঁর মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোয় অবশেষে ঈপ্সিত ভূমির সন্ধান পেয়েছে মাটিকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে। প্রথমে পাশ্চাত্য ও পরে ভারতীয় পুরাণ আর মহাকাব্যের রাজা-রাজরা আর প্রসিদ্ধ দেবদেবীদের অবক্ষয়ী ঐতিহ্য পেরিয়ে তখন তিনি আবহমান মানবসভ্যতার গোপন শক্তির উৎসকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন নামগোত্রহীন খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে। ভেরিয়র এলউইন বা উইলিয়ম আর্চরের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে এবং শিল্পী যামিনী রায়ের মাধ্যমে লোকজীবনের নিহিত ঐশ্বর্য তখন তাঁর চোখে পড়েছে। সুযোগ পেলেই ভীড়াক্রান্ত কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেওঘরের কাছে অনামা ছোটো গ্রাম রিখিরায়। ক্রমে আরো পরিণত আরো পরিবর্তিত হয়ে উঠছেন। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক বা শিল্প আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কতখানি প্রাসঙ্গিক—হঠাৎ হঠাৎ সেই প্রশ্ন তুলে ফেলছেন তাঁর এসময়ের লেখা প্রবন্ধে "...সেখানকার (পশ্চিম ইউরোপের) সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে যথার্থ নয়। আমাদের লোকজীবনের দায়ভাগে রিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম, সিম্বলিজম প্রভৃতির লড়াই অলীক" (বীরবল থেকে পরশুরাম/সাহিত্যের ভবিষ্যত/জনসাধারণের রুচি, পৃঃ-৪৯) অবশেষে আধুনিক শিল্প ও প্রাচ্য প্রবন্ধে তাঁর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত—"...কিন্তু যেহেতু আমাদের আছে ঐক্যচিন্তার ঐতিহ্য যা এখনো জীবন্ত তার প্রাথমিক সুবিধা, তাই ঘোরতর পশ্চিমের শিল্পীদের পুঁথিসর্বস্ব, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে যদিও চিত্তাকর্ষক, সেই অপরিণত আতিশয্যের মধ্যে দিয়ে অন্ততঃ যেতে হবে না...। প্রাচ্যের আদৌ প্রয়োজন নেই এই বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়ের সিঁড়ি পার হবার প্রাচ্যে সর্বদা রয়েছে অ্যাবস্ট্রাকসান বা প্রতীকের ভাণ্ডার। ব্যক্তিগত অবচেতনের খেলার বাইরে তা ছড়ানো রয়েছে এবং পুরাণ বা ধর্মের ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে [৩০]। তাঁর এসময়ের লেখা একটি কবিতাতেও আমরা এই আত্মসমালোচনার সুর শুনি—

"আমরা খুঁজেছি বিলেতী বইতে আপন দেশ,
বারবার তাই দেশের মানুষ ডাইনে বাঁয়ে
ঘুরিয়েছি আর হয়রান হয়ে খুঁজেছি শেষ।
আমরা খুঁজেছি হরেক বইতে আপন দেশ।
থেকে থেকে বই হারিয়েছে, মোড়ে নিরুদ্দেশ
ভাবছি এবার ফিরবো মোড়ল সে কোনো গাঁয়ে?"

(জ্যৈষ্ঠের ট্রিওলেট গুচ্ছ/নাম রেখেছি কোমলগান্ধার)

পরবর্তী প্রজন্মের এক অনুগামী লেখকের কথায়—"He soon shifted the scene from the contemporary disorderlines to the perinniel sense of order still retained in some of the backward villages in India... 'Anwista' is essentially a hymn of praise for men who works from sunrise to sunset against these background [৩১]. আর এক সমকালীন তরুণ লেখকের চোখে—"...he has understood accurately the true nature of India's cultural tradition. His urtan mind, therefore, has found solace

(৩০) রুচির নন্দন মনেরই কবিতা/অরুণ সেন/বিষ্ণু দে-র নন্দন বিশ্ব।

(৩১) Bishnu Dey and the younger generation/Ashim Roy/Bangla-Kabita/Vishnu Dey Spl. No./April, 1970,/P.P. 52.

and nourishment in the light and air of folk culture[৩২]. স্বাভাবিকভাবেই এই পর্বে (১৯৪৪—৪৫) তাঁর রচনায় জলস্রোতের মতো দেখা দিচ্ছে বাংলার এক বিশিষ্ট লোক সাহিত্য 'ঠাকুরমার ঝুলি'র চরিত্রেরা নতুন চেহারায়—দৈত্য, দানব, রাক্ষস, খোক্ষসদের সঙ্গে আপোষহীন লড়াইয়ে রত লালকমল, নীলকমলরা আসছে সংগ্রামী জনতার প্রতীক হয়ে, 'সাত ভাই চম্পা' আর পারুল বোনের চির পরিচিত কাহিনিটি সামান্য পাল্টে, হাজির হচ্ছে মোহমুগ্ধ, অচেতন, পরাধীন দেশবাসীর চেহারায় [৩৩]।

"জেগেছে চম্পা, সাত ভাই ভাবি বসে।
তোমার কাহিনি ছেলেমেয়েদের চোখে
রটবে কেমন রাক্ষসে বর্গিতে
রূপকথা যেন, সেদিন কেই বা রোখে?" (পারুলের ছড়া/সন্দ্বীপের চর)

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ভলাদিমির প্রপের এক উক্তি মনে পড়ে যায়—"...লোককাহিনির চারিত্রিক ধর্মগুলির একটি হল যে তা কাব্যিক উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার উপাদান কল্পলোকের বাস্তব...অন্যদিকে মিথ্ হচ্ছে একটি পবিত্র আখ্যান যা লোকের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করে...। নায়ক যখন তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে এবং গল্পটির ধর্মীয় চরিত্র হারিয়ে যায় তখন মিথ্ এবং কিম্বদন্তী লোককাহিনিতে রূপান্তরিত হয় [৩৪]।

বিষ্ণু দে-র লোকপুরাণ ব্যবহারের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

(১) সাগর রাজার জোয়ার আসে ঘরে নেইকো ধান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর তার ওপরে বান। (ছড়া/সন্দ্বীপের চর)

(২) নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহীন একক তরোয়াল (মৌভোগ—ঐ)

(৩) ঘোচাও চম্পা দুঃস্থ ছদ্মবেশ
এ মাহ্ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ। (সাত ভাই চম্পা/সাত ভাই চম্পা)

এই পর্ব প্রসঙ্গে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ অরুণ সেন আমাদের জানান 'সাত ভাই চম্পার' রচনাকাল শুরু হয়েছিল ফ্যাসী বিরোধী চেতনা এবং তার সঙ্গে স্বদেশী অভিজ্ঞতাকে সংলগ্ন করার সাধনার মধ্যে দিয়ে আর সেই কাল শেষ হ'ল ১৯৪৪-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের নতুন আত্মপ্রকাশের আবহে [৩৫]।

(৩)

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কবিদের ক্রান্তদর্শী বলে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁরা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো প্রজ্ঞাবান। বিষ্ণু দে-র নন্দন চিন্তার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য—"তথ্য আবিষ্কার তিনি নিশ্চয় করেননি, তাঁর

---

(৩২) Arjuna Poet/Dipendranath Bandopadhyay/Source—Ibid.

(৩৩) বিষ্ণু দে ঃ কালে কালোত্তরে/সরোজ ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়/পৃঃ-৫৪, ৫৫

(৩৪) মিথ্ আর লোককাহিনি/ভলাদিমির প্রপ/গাঙ্গেয় পত্র/ডিসেম্বর, ১৯৯০/মিথ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা/ অনুবাদ ঃ আশীষ রায়চৌধুরী/পৃঃ-৮৭, ৮৮

(৩৫) বিষ্ণু দে-র নন্দন বিশ্ব/অরুণ সেন/পৃঃ-১৪

চর্চা বিচ্ছিন্ন গবেষকেরও নয়। তবে যেসব পূর্বসূরীদের এবং সমসাময়িকদের তিনি গ্রহণ ও বর্জন করেন এবং যেভাবে তাঁদের মতামতের একটা অংশে জোর দেন, তাঁদের মধ্যে সম্বন্ধ সূত্র স্থাপন করেন এবং সর্বোপরি এই ঐতিহ্য চিন্তাকে যুক্ত করেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবনায়— সেই বিন্যাসের স্বকীয়তাই তাঁর বৈশিষ্ট্য [৩৬]। প্রত্যাশিত কবিতা ভাবনার বিবর্তনের ফলেই এবং মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষার মধ্যে দিয়ে কবির এই উপলব্ধি হয় যে প্রকৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে অর্থাৎ দেশজ লৌকিক মানসের সঙ্গে কাব্যের একটি সৃষ্টিশীল সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে [৩৭]। কাব্যে, পাশ্চাত্যে, ভারতীয় ও লোক-পুরাণের এই সমন্বিত ব্যবহার প্রসঙ্গে অন্তত একজন আলোচকের সিদ্ধান্ত উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্য ও ভিক্টোরিয় জীবনদর্শনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য এমন একটি মোড় নিল যে লোকমানসজাত সাহিত্য থেকে মধ্যবিত্ত মানসজাত সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল...। বিষ্ণু দে এই দুই-শক্তিকে চাইলেন সমন্বিত করতে [৩৮]। আমরা আগেই দেখেছি যে কাব্যে পুরাণের প্রয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য অতীত ও বর্তমান জুড়ে সময়ের এক অবিচ্ছিন্ন পটভূমি তৈরি করা যার প্রেক্ষিতে কবির উপলব্ধিতে এক দেশকাল-নিরপেক্ষ মাত্রা অর্জন করে। পৌরাণিক কাহিনির প্রতীকে এই পদ্ধতিতে আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ বস্তুত বিষ্ণু দে-র কাব্যের একটি প্রচলিত রীতি [৩৯]। তাঁর কাব্যে তাই আমরা দেখি পাতালবাসিনী নাগ রাজকন্যা উলুপী অবচেতন কামনার আর অতৃপ্তকাম যযাতি বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খল অস্বাভাবিক যৌন জীবনের যোগ্যতম প্রতীক। বিষ্ণু দে কেবল ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে উদাহরণ নিয়ে ক্ষান্ত হননি উলুপীর মতো তিনি স্মরণ করেছেন প্রসার্পিনাকে। বিশৃঙ্খলার দ্যোতনা দিতে গিয়ে গ্রীক শব্দ 'এটাকসিয়া' ব্যবহার করেছেন, সুষুপ্তির বিশ্লেষণ দিয়েছেন 'একেশাষী', সব মিলিয়ে পৃথিবীব্যাপী একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে [৪০]। তাঁর কবিজীবনের শেষ পাদে প্রকাশিত 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' কাব্যগ্রন্থের অসম্পূর্ণ কবিতা 'বাংলায় বাংলায়' এই সমন্বয় প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। কবিতাটি দীর্ঘ আঙ্গিকের এতে 'পূর্বলেখ'র 'জন্মাষ্টমী', 'পদধ্বনি' বা 'সন্দ্বীপের চরে'র জীবনের শ্রেণিরূপের পর্যায়গত বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব ও সমাজস্তরের দ্বন্দ্বোত্তরণ রয়েছে। কবির ব্যবহৃত পুরাণ প্রসঙ্গগুলি এখানে পুনঃপ্রযুক্ত। মানুষের এই অন্তহীন, বিরামহীন অন্বেষণের অভীপ্সা ফুটেছে ঐসব পুরাণ প্রয়োগে, যেমন আমরা দেখব নীচের উদ্ধৃত অংশটিতে—

> নদী বয় তার চেতনায়। তার মনন শিখরে সমুদ্র,
> রত্নাকর কি দিলে অমর্ত্য অপরূপ নব লাবণী?
> কমলে কে দিলে কামিনী? না কি সে নীলকণ্ঠ যে রুদ্রই?
>
> বাংলায় বাংলায়/ঈশাবাস্য দিবানিশা)

অন্বেষণ পথের দুই পার্শ্বে রয়েছে রৌরব নরকের আতঙ্কিত ভয়াবহ পরিবেশ যার সামঞ্জস্য রয়েছে দান্তের নরক বর্ণনার সঙ্গে। এখানে কবি বিদেশী কাব্য ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশজ পুরাণের

---

(৩৬) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়/দীপ্তি ত্রিপাঠী/পৃঃ-২৩১

(৩৭) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়/দীপ্তি ত্রিপাঠী/পৃঃ-২৩১

(৩৮) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়/দীপ্তি ত্রিপাঠী/পৃঃ-২৩১

(৩৯) ঐ, পৃঃ-২৫৯

(৪০) ঐ, পৃঃ-২৩৮

সমন্বয় ঘটাতে উন্মুখ মহাভারতের কুরুক্ষেত্র দর্শন বা কৌরবের হন্তা যজ্ঞের মধ্যে এসেছে দান্তের এই নরকদৃশ্য ইনফের্নো থেকে পুরগেতোরিওতে উত্তরণের মধ্যে প্রগতিরই উত্তরণের ব্যবস্থা করেন—

"মাতা, পত্নী, ভ্রাতা বৃথা ডাকে, পাপক্ষয়
যেতে হয় পথ ভেঙে রাজকীয় শ্রমে
দুহাতে তুষার ঠেলে নিজ মুণ্ড বয়ে
প্রকাশ্যে নরককুণ্ডে, ...[৪১] (ঐ/ঐ)

৪

বিষ্ণু দে-র সাহিত্য জীবনের ফেলে আসা পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করে ক্রমাগত উৎসের দিকে গেলে আমরা দেখতে পাব সেই তরুণ নির্মেদ লেখকটিকে যাঁর শব্দভাণ্ডার ক্রমশ গড়ে উঠছে অনর্গল দেশী বিদেশী মুখ্য ও গৌণ পুরাণ উল্লেখে যা কালক্রমে তাঁর কাব্যের কাঠামোকে চিহ্নিত করবে [৪২]। কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আটকে না থেকে নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতি ঝোঁক তাঁকে নিরন্তর শিল্পের অকর্ষিত ভূমির দিকে ঠেলে দিয়েছে যে তাগিদ থেকে তিনি বিচরণ করেছেন চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের মতো আপাত ভিন্ন শিল্পমাধ্যমের এলাকায়। তাঁর আধুনিকতার এই বিচিত্র সঞ্চারী সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি এই রচনায়। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় তাই যদি অজস্র অচেনা সংস্কৃতগন্ধী শব্দ অনর্গল দেশী বিদেশী পুরাণ, মহাকাব্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ আসে তবে তাকে কবির স্বকীয়তা প্রকাশের মিথ্যে অহঙ্কার নয়, আত্মম্ভরী প্রগলভতা নয় বরং সত্য ভাষণের নিরহংকার একাগ্রতা ও বক্তৃতা বলেই চিহ্নিত করা উচিত [৪৩]। সেই প্রকাশভঙ্গিকে যদি দুরূহ অচেনা ও জটিল বলে মনে হয়, তবে তার দায় শুধু কবির একার নয়, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে সভ্যতার প্রাথমিক সরলতা আজ আর সম্ভব নয়, আজকের জটিল ও কুটিল জীবনে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ করেই কাব্য কল্পতরুর জন্ম দিতে হয় (কাব্যের মুক্তি/পৃঃ-১৪) [৪৪]। এই সুস্থ নতুনত্বের সৎ তাগিদেই ভারতীয় ঐতিহ্যের পুরাণ উপমার পাশে সাবলীলভাবে এসে যায় প্রতীচ্যপুরাণের উল্লেখ [৪৫]। একজন আলোচক 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে অনুমান করেছেন তৎকালীন এম, এ ইংরেজি ক্লাসের মেধাবী ছাত্র বিষ্ণু দে-র বিদেশী সাহিত্য মগ্নতাই তাঁর তখনকার রচনায় এধরনের উল্লেখের একটি প্রধান কারণ [৪৬]। 'উর্বশী ও আর্টিমিস'-এ আমরা দেখেছি জলপরী নেয়াড, সৎর্সি, ড্যানায়ে, ডায়না, এথিনা, ওরায়ন—প্রিয়া, উষা, ভিনাস, এবস মাতা ইত্যাদি গ্রীক ও রোমক মিথিক্যাল চরিত্র, স্যাঙ্গো হেক্টর বা ক্লিওপেট্রার

(৪১) বিষ্ণু দে-র কাব্য ঃ পুরাণ প্রসঙ্গ/বেগম আক্তার কামাল/পৃঃ-৮৪
(৪২) বিষ্ণু দে-এ ব্রতযাত্রায়/অরুণ সেন/পৃঃ-২/৩
(৪৩) ঐ, পৃঃ-২/৩
(৪৪)
(৪৫) ঐ, পৃঃ-৪৯
(৪৬) ঐ, পৃঃ-৪১

মতো পৌরাণিক চরিত্র, খ্রিস্টান বা ইসোল্ডের মতো কাব্যিক চরিত্র কিংবা ম্যামন বা নেয়ানডারতালের মতো চরিত্রেরা। 'চোরাবালি'-তে আমরা পাচ্ছি পৌরাণিক চরিত্র ছাড়াও 'প্রতীচ্যের প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের নানা চরিত্র, নানা অনুষঙ্গী ভাষণ। আধুনিক যুগের সাহিত্য, দর্শন কিছুই বাদ পড়েনি। ডনজুয়ান, প্লেটো, ডিওটিমা, সক্রেটিস, বর্ট্রান্ড রাসেল, বেন লিন্‌সে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, স্লেগেল, হেগেল, অর্ফিয়ুস, পেনেলোপি, ব্রুনহিল্ড, সীগফ্রিও, ফ্রানচেস্‌কারা অনায়াসে উঠে এসেছেন বাংলা কবিতার নিভৃত আঙিনায় [৪৭]।

'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে বিষ্ণু দে-র কাব্য-ভাবনায় পর্বান্তরের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখি আমরা। মার্ক্সীয় বীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তাই তিনি আত্মপরিচয়ের তাগিদে ফিরে এলেন ভারতীয় পুরাণে, হাত রাখতে চাইলেন স্বদেশের সংস্কৃতির ঠিক সেই জায়গায় যেখান থেকে রক্তিম প্রাণপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর আপাদমস্তকে। স্বভাবতই এখন থেকে তাঁর কবিতায় কমে এলো পাশ্চাত্য পুরাণের উল্লেখ। যা কিছু রইলো তা রয়ে গেলো ব্যঙ্গের প্রয়োজনে। অন্যদিকে বেড়ে চললো ভারতীয় পুরাণের উল্লেখ—উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুস্তক থেকে তুলে আনা চরিত্রেরা আসর জাঁকিয়ে বসলো তাঁর কবিতায়। তাঁর শিল্প ভাবনায় মার্ক্সীয় প্রভাবের যে ছাপ পড়ল তার ফলে তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকের সংজ্ঞা পাল্টে যাবার লক্ষণ দেখা দিল। যুদ্ধ, কালোবাজার, মন্বন্তরের ছবি তাঁর কাব্যের প্রথম পর্ব থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে প্রথম কাব্যগ্রন্থ দুটিতে (উর্বশী ও আর্টেমিস এবং চোরাবালি) তিনি সময় ও সমকালের সংকটকে ভাষণ দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় তাঁর অসন্তোষ, কিন্তু 'পূর্বলেখ'-তে আমরা দেখলাম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ছবি। স্বদেশী পুরাণকল্প, যেমন—অর্জুন, উলুপী, নচিকেতা ইত্যাদির উল্লেখ এবং তা মূলতঃ সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও সুস্থিতির প্রতীক হিসেবে—পক্ষান্তরে তাঁর কাব্যে বিদেশী পুরাণ প্রতিমার উল্লেখ প্রধানতঃ দেখি অসঙ্গতি, অরাজকতা বা বিনির্মানের প্রসঙ্গে [৪৮]। 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থ থেকেই প্রধানত আমরা লক্ষ্য করি তাঁর কাব্য রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি বিশ্বব্যাপী সামাজিক অসাম্যের অবসান এবং শ্রমজীবী দরিদ্র জনসাধারণের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তাঁর জীবনের বাকি সময় তিনি বামপন্থার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে অসাম্যের অবসান ঘটানোর স্বপ্ন দেখে গেছেন—যদিও মূলত বুদ্ধিবাদী রচনায় প্রকাশিত তাঁর উদারনৈতিক নান্দনিক মতবাদের নিরন্তর গোঁড়া বামপন্থী বিরোধিতা তাঁকে ক্রমশই বিষণ্ণ, নির্লিপ্ত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাঁর এ পর্বেও বহতা নদীর মতো বিষ্ণু দে-র কাব্যের কৃৎ কৌশলে পরিবর্তন বিবর্তনের খেলা অব্যাহত ছিল। 'পূর্বলেখ'-এ পাশ্চাত্য পুরাণকল্পের বিচিত্র ভুবন থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে ছিলেন পূর্ব দিগন্তে—প্রাচ্য ভূখণ্ডের পরিচিত মানচিত্রে। পরের কাব্যগ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা'য় তিনি পা বাড়ালেন আরো ভিতর পানে। বাইরের দুনিয়ায় ফ্যাসীবাদী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ায় অমিত-বিক্রম প্রতিরোধ তাঁকে টেনে আনলো দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক মন্দায় বিধ্বস্ত বাংলার মানুষের কাছে মানুষের কাহিনি শোনাতে।

---

(৪৭) ঐ, পৃঃ-৫৯।

(৪৮) বিষ্ণু দে ঃ এবং যাত্রায়/অরুণ সেন/পৃঃ-৯১/৯২

তাই তিনি বেছে নিলেন রূপকথা ও ছড়ার সহজতম মাধ্যমটিকে তাঁর কবিতার বাহন হিসেবে—

"কতবার এল কতনা দস্যু। কতনা বার
ঠগে ঠগে হ'ল আমাদের কত গ্রাম উজার
কত বুলবুলি খেল কত ধান
মা গাইল বর্গীর গান
তবু বেঁচে থাক অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।" (এ জনতার/সাত ভাই চম্পা)

বৃত্রা সুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইন্দ্রকে নিজের অস্থি দিয়ে যিনি বজ্র নির্মাণ করতে সাহায্য করেছিলেন মন্বন্তর, অনশন, অর্ধাশনে মৃত বাংলার ভিখারীকে কবি সেই দধিচীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সভ্যতার ভার
যারা বয় আস্থা ভরে, যারা মরে জীবিকা যোগায়
মৃত্যুঞ্জয় আমাদের, দধিচী সে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে...। (১৯৪৩, অকাল বর্ষ/সাত ভাই চম্পা)

তাঁর পরিচিত দুরূহতা থেকে সরে এসে সহজের এই সাধনা আরো পরিণতি পেল পরের কাব্যগ্রন্থ 'সন্দ্বীপের চর'-এ। বাংলাদেশের হৃদয় হতে তুলে আনা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র নীলকমল, লালকমল নতুন চেহারায় হাজির হ'ল দাঙ্গা, যুদ্ধ ও মন্বন্তর বিধ্বস্ত বাংলার মাটিতে।

পাশ্চাত্য পুরাণের পর ভারতীয় পুরাণ এবং শেষে লোকপুরাণ এভাবেই কবি-চিন্তায় বিবর্তনের পথ ধরে দেখা দিয়েছে পর্ব থেকে পর্বান্তরে। তাঁর কাব্যে পুরাণের ব্যবহারগুলি লক্ষ করলে আমরা দেখব তাঁর ব্যবহৃত চরিত্রগুলি বিশেষতঃ পাশ্চাত্য পুরাণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে, সেটি হল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণি কিম্বা মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণি। এই শ্রেণির মূল্যবোধ ও তার ক্ষয়িষ্ণু রূপ উদ্ঘাটনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তিনি প্রতীক নির্মাণে এনেছেন পুরনো মূল্যবোধের স্থিতিশীল প্রতীকগুলি।[৪৯] কাজেই একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে বিষয়বস্তু হিসেবে নয়, তাঁর কাব্যের বিশিষ্ট আঙ্গিকরূপে পুরাণ প্রতিমাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে [৫০]। তবে শব্দ ব্যবহার বা কৃৎকৌশলের দিক থেকে তিনি তথাকথিত সাম্যবাদী কবিতার আদর্শ একেবারেই অনুসরণ করেননি। তাঁর এক গবেষকের মতে এর কারণ "তিনি জীবনাচরণে আবেগ অনুশীলনে নয়, অন্তর্দর্শী আত্মসচেতনতায় চিন্তাগত বৃত্তি দিয়ে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন [৫১]। এঁর মতে অডেনের মতোই মার্কসবাদ বিষ্ণু দে-র কাছে কতটা বেশি রাজনৈতিক তার চেয়েও বেশি মানুষের সৎভাব সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা [৫২]। তাঁর পুরাণ ব্যবহারের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে আমরা দেখবো যখন কবি চতুর্দিকের অসঙ্গতিকে প্রত্যক্ষ করছিলেন, বৈদেশিক পুরাণ প্রসঙ্গ তখন এসেছে ক্রমান্বয়ে, অন্যদিকে, যখন তিনি সঙ্গতি ও সাযুজ্যের

---

(৪৯) বিষ্ণু দে-র কাব্য ঃ পুরাণ প্রসঙ্গ/ বেগম আক্তার কামাল/পৃঃ-২৩
(৫০) ঐ, পৃঃ-৩১
(৫১) ঐ, পৃঃ-৫৬
(৫২) ঐ, পৃঃ-৫৭

সন্ধানী হলেন তখন কমে এল বিদেশী পুরাণের ব্যবহার, অনেক গুণ বেড়ে গেল স্বদেশী পুরাণের উল্লেখ—যাতে তার তাৎপর্য লেখাপড়া-না-জানা মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য হয় [৫৩]। তাঁর কাব্যপুরাণ ব্যবহারের অন্যতম কারণ হিসেবে বিশিষ্ট গবেষক বেগম আক্তার কামাল মনে করেন—ধর্ম এক সময়ে জনসাধারণের অন্যতম সংস্কৃতিরূপে চিহ্নিত ছিল। আধুনিককালে ধর্মের স্থান দখল করতে চাইছে কবিতা। কিন্তু ধর্মের রহস্যপূর্ণ অলৌকিকতা যত সহজে আবেদন সৃষ্টি করতে পারত, কবিতা তা পারে না। তবু সেই অলৌকিকতাকে কবিতায় ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক কবি সচেষ্ট। বিষ্ণু দে-র কাছে পুরাণ ওই ব্যাপারে অন্যতম সহায়ক বলে মনে হয়েছে [৫৪]।

৫

কবি হিসেবে বিষ্ণু দে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের দ্বারা গৃহীত হননি। তাঁর বৈদগ্ধ্য, জটিল ছন্দ কৌশল, মহাকাব্যিক পটভূমি, অনর্গল দেশী, বিদেশী পৌরাণিক চরিত্র, শিল্প ও সাঙ্গিতিক অনুষঙ্গের ব্যবহার এসবই তাঁর নামের আগে অদৃশ্য 'দুরূহ' শব্দটি বসাতে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী প্রজন্মের ওপর তাঁর কবিতার প্রভাব সীমিত। তাঁর অনুসারী কবির সংখ্যাও তাই। এঁদের মধ্যে কবি মনীন্দ্র রায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল; এঁদের কথা সহজেই মনে আসে। ষাটের দশকের বিষ্ণু দে অনুসারী কবিদের কয়েকজন হলেন গণেশ বসু, অনন্ত দাশ, শিশির সামন্ত, দীপেন রায়, শুভ বসু এঁরা। সত্তর দশক থেকে বাংলা কবিতায় আবার পালা বদলের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, আশির দশকে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় সাম্যবাদী শাসনের অবসান, নব্বইয়ের দশকে এবং তারপর থেকে বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য, আর্থ-সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন এবং ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে তা অসমাপ্ত থেকে গেল। বর্তমানে তার মধ্যে গত প্রজন্মের কবিতার কোনো প্রভাব দুর্লক্ষ্য বললে বোধহয় অন্যায় হবে না।

সে যাই হোক, বিষ্ণু দে-র কাব্যে পুরাণকল্পের বিভিন্ন প্রয়োগের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সভ্যতার ইতিবৃত্তে মানুষের অনুপ্রবেশ থেকে সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের শুরু। সৃষ্টির মুহূর্তে যে প্রাণিটি ছিল জীবজগতের সবচেয়ে অসহায় ও দুর্বল প্রতিনিধি,—বিরুদ্ধ প্রকৃতির কৃপাপ্রার্থি,—কালক্রমে সেই অসম দ্বৈরথে সে জীবজগতের শাসনদণ্ডটি করায়ত্ত করেছে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসে অত্যাচারী একনায়কের দীর্ঘদিনের শাসনকে নস্যাৎ করে নামগোত্রহীন সাধারণ মানুষ বারবার এগিয়ে এসেছে সামনের সারিতে। তাই মানুষই দেবতা—এই হল নবযুগের মিথ্ বা পুরাণকল্প [৫৫]।

❑ গ্রন্থ/পত্র-পত্রিকা সূত্র

---

(৫৩) বিষ্ণু দে-র কাব্য পুরাণ প্রসঙ্গ/বেগম আক্তার কামাল/পৃঃ-২৩

(৫৪) ঐ, পৃঃ-১০৬

(৫৫) আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব/মঞ্জুভাষ মিত্র

১। আধুনিক বাংলা কবিতার ইউরোপীয় প্রভাব—মঞ্জুভাষ মিত্র। প্রকাশক—শ্রী প্রশান্ত মিত্র; নবার্ক; ডি. সি. ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান লেন, পোঃ দেশবন্ধু নগর, কলকাতা—৭০০০৫৯।
২। বিষ্ণু দে—অরুণ সেন/ভারতীয় সাহিত্য সাধক পুস্তকমালা। প্রকাশক ঃ সাহিত্য অকাদেমি। প্রথম প্রকাশ—১৯৯৮; রবীন্দ্র ভবন, ৩৫, ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি—১১০০০১।
৩। বিষ্ণু দে'র নন্দন বিশ্ব ঃ অরুণ সেন। প্রকাশক ঃ অবসর, ঢাকা, বাংলাদেশ। প্রথম প্রকাশ—বইমেলা, ১৯৯৬।
৪। বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার—কমলেশ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ক'লকাতা—৭০০০৭১। প্রথম প্রকাশ—আগষ্ট, ১৯৮০।
৫। বিষ্ণু দে-র কাব্য ঃ পুরাণ প্রসঙ্গ—বেগম আক্তার কামাল। প্রথম প্রকাশ—আগষ্ট ১৯৭৭, মুক্তধারা—৩১৪। প্রকাশক ঃ চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ)। ৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা—১, বাংলাদেশ।
৬। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী। প্রকাশক ঃ শ্রী সুধাংশু কুমার দে (দে'জ পাবলিশিং)। তৃতীয় সংস্করণ—পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৯১, মে, ১৯৮৪।
৭। বিষ্ণু দে ঃ এ ব্রত যাত্রায়—অরুণ সেন। প্রকাশক ঃ অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগল কিশোর দাস লেন, ক'লকাতা—৬। প্রথম প্রকাশ—নববর্ষ, ১৩৯০।
৮। আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়—অশ্রুকুমার সিকদার। প্রকাশক ঃ অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগল কিশোর দাস লেন, ক'লকাতা—৬।
৯। বিষ্ণু দে কালে কালোত্তরে—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, ক'লকাতা—৯, অক্টোবর, ১৯৯৪।

❑ পত্র-পত্রিকা

১। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৭৯।
২। এবং এই সময় ঃ বিষ্ণু দে সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৬
৩। Bangla Kabita, Vishnu Dey, Spl. Number 1970.
৪। নান্দীমুখ ঃ বিষ্ণু দে সংখ্যা (১৯৭৩), আগরতলা, ত্রিপুরা।
৫। গাঙ্গেয় পত্র—১২/অগ্রহায়ন, ১৩৯৭/ডিসেম্বর, ১৯৯০, মিথ্ সাহিত্য সংস্কৃতি সংখ্যা।
৬। কবিপত্র ঃ বিষ্ণু দে সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৬

❑ এছাড়া বিষ্ণু দে'র কবিতার উদ্ধৃতিগুলি এবং তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রতিমা এবং তার উৎসের তালিকা প্রস্তুতিতে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত বিষ্ণু দে'র কাব্যসংগ্রহ (১ম, ২য় ও ৩য়) খণ্ডগুলির ব্যবহার করা হয়েছে। তালিকা তৈরিতে এবং এই সময় পত্রিকার উপরে উল্লিখিত সংখ্যাটির শেষে সংযোজিত এবং সম্পাদক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকলিত তালিকাটিও ব্যবহার করা হয়েছে।